Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 369 – 382
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সর্প দংশনের লোক চিকিৎসা : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা

ড. বুবুল শর্মা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : bubulsarma1973@gmail.com

Keyword
ঝাড়-ফুক্, ঢ্যামনা, ওঝা, তাগা, বিষহরী, ডোর, হিছার বান্দ।

Abstract
সর্প দংশনের লোক চিকিৎসায় তুক্-তাক্, ঝাড়-ফুকের যে একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে সেই পদ্ধতি আমাকে আকর্ষিত করেছিল। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আমি এই পদ্ধতিকে জানার চেষ্টা করেছিলাম। বরাক উপত্যকা সাপের বসবাসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অনেক সময় হাল চাষ করতে, জঙ্গল পরিষ্কার করতে কিংবা গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজকর্ম করতে মানুষ সাপের কামড় খায়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঝাড়- ফুক্'এর মাধ্যমে সাপে কাটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বর্তমান সময়ে সেই রকম ঝুপ-জঙ্গল নেই তাই, সাপের উপদ্রবও অনেক কম। তথাপি মাঝে- মধ্যে সাপে কাটা রোগীর কথা শুনতে পাওয়া যায়। উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে মানুষ হসপিটালেই যান, আবার ওঝার শরণাপন্ন হতেও শোনা যায়। বস্তুত ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের সাথে আমাদের বরাক উপত্যকায়ও বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র, তাগা, কবচ-মাদুলি, ঝাড়-ফুক্, তুক্-তাক্, বশীকরণ ইত্যাদির প্রচলন এখনো আছে।

Discussion

এক

অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দক্ষিণ আসামের তিনটি প্রশাসনিক জেলা (কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি) নিয়ে গঠিত প্রান্তিক জনপদ বরাক উপত্যকা। চারদিকে চিরসবুজ অরণ্যানী, খাল-বিল, নদী-নালা, ঝোপ-ঝাড়, সারি-সারি চা-বাগানের বিচিত্র মন মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহের মাঝে বরাক উপত্যকার জনপদ। বরাক উপত্যকার ভূ-প্রাকৃতিক গঠন সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য --

> "চট্টগ্রামের পার্বত্য- চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য- ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়াকান্দি অঞ্চল, এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই

বলিতে হয়। এই সব ভূখণ্ড পুরাতন গঠন, এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।"[১]

প্রাচীনকাল থেকেই উক্ত উপত্যকায় মানুষের বসবাস ছিল এবং তাদের ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ পরিলক্ষিত।

সর্প দংশনের লোক চিকিৎসায় ঝাড়-ফুকের পদ্ধতি আমাকে আকর্ষিত করেছিল। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আমি এই পদ্ধতিকে জানার চেষ্টা করেছিলাম। নদী, নালা, খাল, বিল, ঝোপ-জঙ্গল, চা বাগান পরিবেশিত আমাদের এই বরাক উপত্যকা সাপের বসবাসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অনেক সময় হাল চাষ করতে, জঙ্গল পরিষ্কার করতে কিংবা গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজকর্ম করতে মানুষ সাপের কামড় খায়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঝাড়- ফোকের মাধ্যমে সাপে কাটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বর্তমান সময়ে সেইরকম ঝুপ-জঙ্গল না থাকার জন্য সাপের উপদ্রবও অনেক কম। তথাপি মাঝে-মধ্যে সাপে কাটা রোগীর কথা শুনতে পাওয়া যায়। উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে মানুষ হসপিটালেই যান, আবার ওঝার শরণাপন্ন হতেও শোনা যায়। বস্তুত ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের সাথে আমাদের বরাক উপত্যকারও বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র, তাগা, কবচ -মাদুলি, ঝাড়-ফুক্, তুক্-তাক্, বশীকরণ ইত্যাদির প্রচলন এখনো আছে। লোকসমাজে প্রচলিত কয়েকটি মন্ত্রের নমুনা তুলে ধরা হল–

সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্র –

(১)

"নিজ মনে চলিয়া যায় পথ দিয়া কে।
সঙ্গে যায় নানা সর্প হেলে দুলে যে।।
হাত বাঁধনু গলা বাঁধনু পিঠ বাঁধনু জোরে।
আর বুক অষ্টাহে বাঁধনু আমি মনসার বরে।।
আর আজ্ঞে –
মা মনসার আজ্ঞে।।"[২]

লক্ষণীয়, জলে-জঙ্গলে, অথবা সাপ ধরার প্রাক্ মুহূর্তে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই মন্ত্রটি তিনবার পড়ে নিজের শরীরে 'ফুঁ' দিলে সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২)

"কাল ফুল মেঘ আন্ধারা রাতে-
না জানি পদ্মা কামড়াল কোন জাতে -
ডানে কামড়ালে বাঁয়ে ঝাড়ে -
সাপের বিষ সোত্তান মারও
হেঠ ছাড়া বিষ যদি উজান ধাস
দোহাই লাগে 'পদ্মা' '৩৩' কোটি দেবতা-কার্তিকের মাথা খাস।"[৩]

লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, সাপে কামড় দিয়েছে এমন ব্যক্তির কানের কাছে এই মন্ত্র পাঠ করলে সাপের বিষের প্রভাব কেটে যায়।

সাপকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মন্ত্র রচিত হয়েছে তার পেছনে কিছু লোকসংস্কার ছিল। তাছাড়া, সাপের

বিষ ঝাড়নের বহু মন্ত্র আছে। অঞ্চল বিশেষে এক এক গুণিন বা ওঝা ভিন্ন ভিন্ন রকমের মন্ত্র ব্যবহার করেন এবং, রোগীর অবস্থা অনুযায়ী মন্ত্র প্রয়োগেরও তারতম্য আছে। তাই বলা যেতে পারে –

> "মন্ত্র কেবলমাত্র জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মন্ত্রও রূপকথার মত গল্প শোনায়, অনেক সৃষ্টিতত্ত্বের খবর পরিবেশন করে, অজানা রহস্যের সন্ধান দেয়।"[৪]

আর এই লোকসংস্কার থেকেই গড়ে উঠেছে নানা লোকবিশ্বাস। গ্রামের নারীরা অনেক সময় নিজের অকর্মণ্য স্বামীকে 'ঢ্যামনা' বলতেন। 'ঢ্যামনা' মানে নির্বিষ 'ঢোঁড়া' সাপ। লোকবিশ্বাস কোন এক সময় ঢোঁড়া সাপের মারাত্মক বিষ ছিল। এই ঢোঁড়া সাপকেই দেবী মনসা লক্ষিন্দরকে দংশনের জন্য প্রথমে আদেশ দিয়েছিলেন। যাত্রা পথে জলে মাছ দেখে ঢোঁড়া সাপের লোভ হয়েছিল, সে তার বিষ কচু পাতায় রেখে মাছ খেতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ঢোঁড়া সাপ দেখে বিছে, বোলতারা সেই বিষ খেয়ে নিয়েছে। সেই সময় থেকেই ঢোঁড়া সাপের আর বিষ নেই। ছড়ার মধ্যেও ঢোঁড়া সাপের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

"মুখখানা তার কুলো পানা
ঢোঁড়া সাপের চক্করে
হার মানে যায় কেনা জানে
তাহার সাথে টক্করে।"[৫]

তাছাড়া বিভিন্ন লোকাচারেও ঢোঁড়া সাপের উপস্থিতি লক্ষণীয় –

> "রোববার বা মঙ্গলবার যদি কাউকে ঢোঁড়া সাপ কামড়ায় তবে সেই মানুষকে যতদিন না কোন বিষাক্ত সাপ কামড়াবে ততদিন তার মৃত্যু হবে না। অথবা যদি সে অন্য কোন বিষাক্ত সাপের উপর দিয়ে হেঁটেও চলে যায় তবুও তাকে কামড়াবে না।"[৬]

লক্ষণীয়, 'মনসামঙ্গল' কাব্য নানা অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। ঐন্দ্রজালিক আচার-আচরণ, ঝাড়-ফুকের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, তুক্-তাক্ বশীকরণ, অভিশাপ নানা ধ্বংসলীলা ইত্যাদি সবকিছুই অলৌকিকতায় বা ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতিতে ঘটে থাকে। আমরা জানি মঙ্গল দেব-দেবীরা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। বস্তুত অলৌকিকতা যুগের মানসিকতা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। অলৌকিকতায় মানুষের বিশ্বাস এখনো আছে, কিন্তু বাস্তব সত্যের উপর ততটা বিশ্বাস নেই। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্প দংশনে মৃত লক্ষীন্দরের বিষ দূরীকরণের যে প্রক্রিয়া তাতে দেবী পদ্মার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' আমরা লক্ষ্য করতে পারি –

"ও বিষ নাইরে।

লখির শরীরে বিষ নাইরে।।

\- - -

রক্ত পড়ে পুঁষ পড়ে পানী।

ওলা কালকূট বিষ আদ্যের কাহিনী।"[৭]

দুই

প্রাচীন মানুষ নিজের অজ্ঞতাবশত ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানা ব্যাধি, দুঃখ কষ্ট ইত্যাদিকে আতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রোধ বা আক্রোশ বলে মনে করত। কিন্তু বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানুষ অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আজও সাপে কাটা মানুষের চিকিৎসায় ওঝা-গুণিনের দারস্থ

হতে হয়। সর্প বিষ নিবারণের নানা প্রক্রিয়ায় ওঝারা ঝাড়ণ, জল পড়া, তাগা বন্ধন, নানা মন্ত্র চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করার চেষ্টা করেন। দ্রুতগতি সম্পন্ন এই সরীসৃপ প্রাণীটির সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কোন না কোন সূত্রে সাক্ষাৎ ঘটবেই। তাই, সর্প ভীতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে কত না প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। এবারে আমরা বরাক উপত্যকায় সাপের কামড়ের বিষঝাড়া সম্বন্ধে দক্ষিণা শর্মার বক্তব্য শুনবো- (দক্ষিণা শর্মা, গ্রাম ও পোস্ট অফিস -নরসিংহপুর, জেলা - কাছাড় (আসাম), পিন কোড-৭৮৮১১৫, বয়স-৮৪ (২০১২), অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ১৩ মে রবিবার -২০১২) দক্ষিণা শর্মার বন্ধু নামকরা নতুন বাজারের (কাছাড় জেলা) যামিনী ওঝা। তাকে যামিনী পোদ্দারও বলা হতো কারণ, তিনি একাধারে মনসা পূজায় ওঝা নৃত্য পরিবেশন করতেন,ঠিক তদ্রূপ সোনা -রূপার অলংকার প্রস্তুতও করতে পারতেন। তাছাড়া তিনি বৃহত্তর নরসিংহপুর এলাকার নামকরা কবিরাজও ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি সাপের কামড়ের চিকিৎসাও করতেন। যামিনী ওঝা যখন কোন সাপে কাটা রোগীর বাড়িতে যেতেন, তখন যদি সময় থাকতো তাহলে বন্ধু দক্ষিণাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেই সূত্রেই দক্ষিণা শর্মা সাপের কামড়ের বিষ ঝাড়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাকে দিতে পেরেছেন।

জলের সাপে কামড় মেরেছে একজন মেয়ে মানুষকে। মেয়ে মানুষটির শরীর থেকে বিষ অনেক ওঝা নামাতে পারেন নি তাই, শেষ পর্যন্ত নামকরা ওঝা যামিনী পোদ্দারকে আনা হয়েছে। সেই দিনের সঙ্গী ছিলেন বন্ধু দক্ষিণা শর্মা। যামিনী ওঝা সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টা করেও রোগীর শরীর থেকে বিষ নামাতে পারেননি। বহু দিনের সঙ্গী বন্ধু দক্ষিণা নিজের অভিজ্ঞতায় বললেন, 'আমার মনে হয় তুমি রোগিনীর শরীর বন্ধন করনি, তাই কেহ উক্ত মহিলার শরীরের বিষকে থামিয়ে রেখেছে।' এই বন্ধনের নাম 'হিছারবান্দ'। 'হিছারবান্দ' দিয়ে সাপের কামড়ের রোগীকে সুরক্ষিত রাখা হয় (মানে হিছারের মধ্যে রোগীকে রাখতেই হবে)। যাতে অসৎ কোন ব্যক্তি রোগীর শরীরকে 'থামিয়ে' না রাখতে পারে। রোগিনীর অবস্থা সঙ্গিন দেখে যামিনী ওঝা শরীরবন্ধন না করেই বিষ ঝাড়া শুরু করেছেন তাই, অক্লান্ত চেষ্টা করেও রোগীর শরীর থেকে বিষ নামাতে পারেননি। তখন যামিনী ওঝা রোগিনীর শরীরকে সেই 'থামা' থেকে মুক্ত করার জন্য মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। মন্ত্র বলে যামিনী ওঝা 'থামা' থেকে রোগিনীকে মুক্ত করে রাত দুটোর সময় সম্পূর্ণ বিষ ঝেড়ে সুস্থ করে তুলেন। বিষ পাতালে চলে যায়। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ 'থামা' থেকে রোগীর শরীরকে মুক্ত করার জন্য দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন দক্ষিণা শর্মা –

১. মন্ত্র বলে সেই 'থামা' থেকে রোগীর শরীরকে মুক্ত করা হয়। যদি এই মন্ত্র পদ্ধতিতে কার্যকরী না হয় তখন,

২. নতুন একটি মাটির পাতিলে একটি পান দিয়ে ওঝা পুকুরের জলে ডুব দেবেন। ওঝা জলের নিচে মন্ত্র পাঠ করে ছুরি দিয়ে পাতিলের মধ্যে রাখা পানটিকে একটানে দ্বিখণ্ডিত করবেন এবং পান জলে ভাসার পূর্বেই ওঝাকে জলে ভাসতে হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। এই কার্য শেষ হবার সাথে সাথেই রোগীর শরীর থেকে 'থামা'র গুণ কেটে যাবে। কিন্তু, যে ব্যক্তি এই অপকর্ম (থামা) করেছিল, সে যেখানেই থাকবে না কেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়তে-চড়তে পারবে না অথবা সেখানেই পড়ে যাবে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সাপের কামড়ের পরীক্ষা –

১. যে কোন মহিলার মাথার একটি লম্বা চুলকে নিয়ে ওঝা মন্ত্র পাঠ করে শুদ্ধ করে তুলেন, তারপর দুহাতের আঙ্গুলে পেঁচিয়ে যে জায়গায় সাপ কামড় মেরেছে তাঁর উপর থেকে নিচের দিকে নামাবেন। ক্ষতস্থানের উপর আসার পর চুলটি যদি ছিড়ে যায় তাহলে, বিষাক্ত সাপের কামড়। আর যদি না ছিড়ে তাহলে নির্বিষ সাপের কামড় তখন, আর কোন ভয় থাকে না।

২. সর্প দংশনের আকৃতির উপর নির্ভর করে বলা যায় বিষযুক্ত না বিষহীন সাপের কামড়।

৩. যামিনী ওঝা মন্ত্র পাঠ করেই বলে দিতে পারতেন রুগীর শরীরে বিষ আছে, না নেই।

৪. সাপের দাঁত ক্ষতস্থানে রয়েছে কিনা তা জানার জন্য লম্বা চুল নিয়ে তার দু মাথা ধরে ক্ষতস্থানের উপর থেকে নিচের

দিকে টানতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় যদি চুল ছিড়ে যায় তাহলে, রোগীর শরীরে সাপের দাঁত রয়ে গেছে।

অন্য একটি প্রসঙ্গে দক্ষিণা শর্মা আমাকে বলেছেন, নরসিংহপুরেরই অন্তর্গত একটি গ্রাম শান্তিপুরের একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ খুবই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। প্রত্যেক বছরই উনার বাড়িতে গুরুদেব আসতেন। এইরকমই একবার গুরুদেব উনার বাড়িতে এসেছেন। শিষ্য গুরুকে সাদরে আপ্যায়ন করেন। কিছু সময় পর গুরু- শিষ্যের মধ্যে কোন একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। রাগের বশবর্তী হয়ে শিষ্য গুরুদেবকে প্রহার করে। এই অপমানে গুরুদেব অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শিষ্যকে অভিশাপ দিয়ে চলে যান। এই ঘটনার তিন মাসের পর শিষ্যের সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। তিনি ব্যথার জ্বালায় মাটিতে পড়ে আছাড় খান, নানা চিকিৎসা করার পরও ব্যথার একটুও উপশম হয়নি। তখন শেষ ভরসা যামিনী পোদ্দার। শিষ্যের বাড়ির লোকজন যামিনী পোদ্দারের বাড়িতে যান এবং রোগীর বর্ণনা দেন। তারপরের দিন যামিনী পোদ্দারের সাথে যথারীতি দক্ষিণা শর্মা এবং যামিনী পোদ্দারের বাংলাদেশ থেকে আগত গুরুদেব, তিনিও সঙ্গী হলেন।

যামিনী পোদ্দার রোগীকে পরীক্ষা করে পদ্মপুরাণ পালা শুরু করে 'ছিলকা' (বিষ ঝাড়ার মন্ত্র) টানতে লাগলেন। রোগীর শরীরের উপরের অংশ থেকে বিষ নেমে কোমর পর্যন্ত এসে আবার সমস্ত শরীর বিস্তার লাভ করে। এইভাবে চার ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও বিষ নামানো যায়নি তখন, যামিনী পোদ্দারের গুরুদেব বিষের প্রতিক্রিয়া শরীরে কিরূপ তা পরীক্ষা করার জন্য রোগীর স্ত্রীকে বললেন, একটা কাঁচা কলা ও মাথার একটি লম্বা চুল দেওয়ার জন্য। তারপর চুলের একদিকে আঙুল পেঁচিয়ে দক্ষিণা শর্মা অন্যদিকে গুরুদেব ধরে রোগীর শরীরের কাছে এনে মন্ত্র পাঠ করে কাঁচা কলা চুলের উপরে ফেলে দিলে কলা দ্বিখন্ডিত হয়নি। তখন গুরুদেব বললেন এই রোগী অভিশাপগ্রস্থ, তার মুক্তি নেই, এই মারণ যন্ত্রণা থেকে। কারণ সে নিজের গুরুদেবকে প্রহার করে মহাপাপ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে দক্ষিণা শর্মা আমাকে বলেছেন, ইন্দ্রমনির মা' (গ্রাম- শালগঙ্গারপার, জেলা-কাছাড়) বলে একজন নামকরা মহিলা ওঝা ছিলেন। তিনি আজ থেকে প্রায় (২০১২) ৭০ বছর পূর্বে বিষ ঝাড়া এবং অন্যান্য কবিরাজি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। উনার বিষ ঝাড়ার প্রক্রিয়াটা একটু অন্যরকম ছিল। শ্রাবণী পাট (শাক) (শ্রাবণ মাসে মাঠ থেকে যে পাট নেওয়া হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় শ্রাবণী পাট বলে) থেকে কিছুটা নাল (ফালি) নিয়ে রোগীর ক্ষতস্থানের উপরে বেঁধে একটা অংশ মাটিতে পুঁতে দিতেন। তারপর বিষ ঝাড়তে শুরু করে বিষ গলাতেন। বিষ যখন গলতো (নামতো) তখন অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, পাটের নালী বেয়ে কালো রক্ত বের হয়ে মাটিতে মিলিয়ে যেতে, অর্থাৎ বিষ পাতালে চলে গেল।

তিন

নিজের জীবনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা আমাকে খুলে বলেছেন, সত্যম অধিকারী। (ঠিকানা- তারাপুর, শিববাড়ি রোড- শিলচর, জেলা- কাছাড়, রাজ্য- আসাম, পোস্ট অফিস- তারাপুর, পিন কোড- ৭৮৮০০৩, পেশা- শিক্ষক ও সংগীতশিল্পী, বর্তমান বয়স - ৩৫, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১৬ই জুন, রবিবার- ২০১৩) আমাদের বংশে দেবী মনসা পূজার কোন মানস ছিল না কিন্তু, আমরা প্রত্যেক বছরই দেবী মনসার মূর্তি পূজা দেই। আমাদের যাওয়ার রাস্তায় বর্ষার সময় প্রচুর জল থাকে। জলে সাপও চলে আমরাও চলি কিন্তু, সাপ আমাদের কোন ক্ষতি করে না, আর আমরাও সাপ দেখে ভয়ও পাইনা। আমাদের মনে একটা বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে সাপ আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। টাকা পয়সা যদি হাতে না থাকে তাহলেও ঠিক পূজার পূর্বেই টাকা জোগাড় হয়ে যায়। মোটামুটি ২০ বছর থেকে আমরা দেবীর পূজা করে আসছি, পুজোতেও কোন ধরনের অসুবিধা হয় নি। একদিন ঘুমানোর পর রাত্রে স্বপ্নে আমার এক বন্ধু একটি সাপ আমাকে উপহার দেয়। সেই বন্ধুকে আজ পর্যন্ত চিনতে পারিনি। স্বপ্নে বন্ধু আমাকে উপহার দিয়ে বলেছে, দেখ কি দিয়েছি? খুলে দেখি একটা বড় 'দাড়াস' সাপ। আমি আঁতকে উঠে তাকে বলি, মানুষকে কি কেউ সাপ উপহার দেয়? প্রত্যুত্তরে বন্ধু বলল, এই সাপের কোন দাঁত নেই তাই, তোর কোন ক্ষতি করবে না। তোর সাথে সারাদিন খেলা করবে। বিশেষ করে অন্যের কাছে তোর আলাদা একটা কদরও থাকবে। সাহসে ভর করে নিয়ে নিলাম। তিন দিন

আমার সাথে সাপটি খুব খেলা করেছে। চার নম্বর দিনে খেলতে গিয়ে অসাবধানতায় সাপের লেজে আমার পায়ের চাপ পড়ে, তখন সাপটি আমার পায়ের নিচে কামড় দিয়ে দেয়। দুটো দাঁতের কামড় থেকে অল্প রক্ত বের হতে থাকে। তখন আমি নিকটবর্তী একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে ফোনে সমস্ত কথা জানাই। তিনি বলেন, সাপ যেহেতু একবার কামড় দিয়েছে, সেই জন্য সাপের বিষ তোমার শরীরের সাথে খাপ খেয়ে নেবে, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি শান্তি পাই, স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরের দিন আমার মা আমাকে বলেন, জানিস কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি, লালপাড় শাড়ি পরিহিত বড় সিঁদুরের ফোটা দেওয়া একজন সুন্দরী রমণী বলেছেন, তোদের নিদিষ্ট দোকান থেকে পূজার সামগ্রী না কিনে পাশের দোকান থেকে কিনে নিবি কারণ, ওই দোকানের জিনিস ভালো। তখনই আমার (সত্যম অধিকারী) মনে পড়ে গতরাত্রের স্বপ্নের কথা। উৎসাহবসত বাম পায়ের নিচে তাকিয়ে দেখি, স্বপ্নে সাপ যে জায়গায় কামড় দিয়েছিল,ঠিক সেই জায়গায় সত্যিই সাপের কামড়ের দুটি দাঁতের চিহ্ন স্পষ্ট। যতটুকু জানি মা মনসা নিজের পূজা আদায় করার জন্য নানা ছলনার আশ্রয় নেন। যেদিন আমি স্বপ্ন দেখি তার আগের দিন মাকে বলেছি, হাতে টাকা নেই তাই আগামী মাসে দেবীর পূজা দেব। ঐদিন রাত্রেই দেবী স্বপ্নে হাজির হয়ে ভয় দেখান। সেই ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মাসেই দেবীর পূজা দেওয়া হয়। কিন্তু একটা কথা, যখনই ঐ স্বপ্নের বিষয় নিয়ে কথা বলি তখনই, পায়ের নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে চুলকায় কিন্তু, ব্যথা কোনদিন করেনি।

কয়েকদিন পর আমি একজন নামকরা ওঝাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানাই। তিনি বললেন, 'স্বপ্নে যদি সর্প দংশন করে তার থেকে আর শুভ হতে পারে না। আর স্বপ্নে যদি সর্প দংশন না করে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে শত্রুবৃদ্ধি হয়।' তুমি নিশ্চিত থাকো তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তথাপি চুলকানি থেকে উপশম পাওয়ার জন্য একজন ওঝাকে দিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে নিও কারণ, তোমার পায়ের নিচে বিষ দাঁত রয়ে গেছে তাই চুলকায়। বিষ ঝাড়ানোর পর আর চুলকাবে না। তিনি আরো বলেছেন, এইভাবে স্বপ্নে অনেকেই সাপের কামড় প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার থেকে বিষ উৎপন্ন হয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তখন যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয় তাহলে মৃত্যুও হতে পারে। তিনি বলেছেন, তারাপুর ই এন ডি কলোনির একজন ভদ্রলোক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন সাপ তাকে দংশন করেছে ডান পায়ে। পরেরদিন তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখেন, ডান পা ফুলে গেছে এবং প্রচন্ড ব্যথা। ব্যাথার জ্বালায় তিনি হাঁটতে পারছেন না। এইভাবে তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর একজন ওঝাকে দিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে নেন। তারপর থেকে তার ব্যথা ও ফুলা কমে যায়।

চার

আমাদের বরাক উপত্যকায় অনেক কবিরাজ আছেন, তারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার সাথে সাপের কামড়ের বিষ ও ঝাড়েন। তাদেরকেও ওঝা বলা হয় কিন্তু, তারা মনসা পূজায় নাচ গান করেন না; অথচ সমগ্র পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের পালা গুলি গান গেয়ে গেয়ে বিষ ঝাড়তে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি, বরাক উপত্যকার বাঙ্গালি হিন্দু কবিরাজের তুলনায় বাঙালি মুসলমান কবিরাজের সংখ্যা বেশি। এইরকমই একজন বৃহত্তর পাথারকান্দি(করিমগঞ্জ জেলা) অঞ্চলের নামকরা কবিরাজ, তুতিউর রহমান, (গ্রাম - বারোআইল, পোস্ট অফিস - পাথারকান্দি, পিন কোড- ৭৮৮৭২৪, জেলা- করিমগঞ্জ (আসাম), থানা- পাথারকান্দি, পেশা- জুম চাষ ও কবিরাজি (বিশেষ করে সাপের কামড়ের বিষ ঝাড়া), বয়স -৬৩, সংগ্রহের তারিখ - ২৯ জুন ২০১২, শুক্রবার)। আমি উনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি, সাপে কাটা মানুষের বিষ ঝাড়ার নানা প্রক্রিয়া। জানতে পেরেছি পদ্মাপুরাণের এক একটা পালা গান গেয়ে তারপর মন্ত্র প্রয়োগ করে বিষ ঝাড়তে হয়।

আনুমানিক ৩০/৩৫ (২০১২) বৎসর থেকে তুতিউর রহমান এই পেশার সাথে যুক্ত। ওনার ওস্তাদের নাম মোশারফ আলী। উনি ১০৫ বৎসর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে মোশারফ আলী সাপে কাটা মানুষের বিষ ঝাড়ার সমস্ত মন্ত্রগুলি শিখিয়ে দেন শিষ্য তুতিউর রহমানকে। শিষ্য তুতিউর রহমান প্রায় ৩০ বৎসর গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা

গ্রহণ করেছেন। দুঃখ করে তুতিউর রহমান বললেন, আমরা গরীব মানুষ দিন আনি দিন খাই, বিদ্যা শিক্ষা আমাদের মত মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন ততাপি, যা কিছু লেখাপড়া শিখতে পেরেছি তা আমার গুরু মোশারফ আলীর সান্নিধ্যে। তবে বেশিরভাগ মন্ত্রগুলি গুরু মুখে মুখে শিখিয়েছেন, মন্ত্র গুলির কোন লিখিত দলিল নেই। সর্প দংশনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমার এতটাই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, আমি একদিন থেকে পাঁচদিনের সাপে কাটা মৃত মানুষকেও জীবিত করতে পেরেছি। 'পুতনী' চা- বাগানে (করিমগঞ্জ) গিয়ে পাঁচ দিনের মৃত একজন শুক্লবৈদ্য পুরুষ মানুষকে জীবিত করা আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা।

এবারে আমরা সাপে কাটা মানুষের কীভাবে লোক চিকিৎসা করতে হয়, তা আমরা তুতিউর রহমানের কাছ থেকেই জানবো। প্রথমে সাপের কামড়ের বিষ ঝাড়তে গিয়ে একটা আসর দিয়ে চতুর্দিক বন্ধ করার জন্য বন্দনা গান গাওয়া হয়। বিষ ঝাড়তে গিয়ে আসরটাকে যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে, অন্য কেহ বাইরে থেকে বাণ-বেদ, জাদু-টোনা করে রোগীর শরীরের বিষ আটকিয়ে রাখতে পারে, রোগীকে থামিয়ে রাখা, বা নষ্ট করতেও পারে। সেই জন্য চতুর্দিক বন্দনা করে একটা মন্ত্র পাঠ করা হয়। মন্ত্রটি নিম্নরূপ –

'পূর্ব-পশ্চিম বন্দ ছোয়ার বন্দ।
উত্তর দক্ষিণ বন্দ হস্তির উপর মাউত বন্দ।।
আকাশ পাতাল বন্দ ফতিমা বন্দ পাও।
ওই বান্দ ভাঙ্গিলে হযরত আলীর মাথা খাও।।
তবে যে ওই বান্দ ভাঙ্গিবে,
তার মাথা ভাঙ্গি ভূমিত পড়িবে।'

- লক্ষণীয়, শব্দ ব্রহ্ম একথা ঠিক।

"শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়ে যথাস্থানে প্রযুক্ত হলে তার ক্রিয়া পাওয়া যায়।"[৮]

কিন্তু, আলোচ্য মন্ত্রটির শব্দধ্বনি যথোপযুক্ত ভাবে উচ্চারিত হলো এবং সঠিক স্থানে প্রয়োগ করলেও মন্ত্রটির ক্রিয়া কতটুকু কার্যকরী হতে পারে, তা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। তা যাই হোক, আমরা মূল স্রোতে আবার ফিরে আসি; উক্ত মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করে রোগীর চতুর্দিক বন্ধ করা হয়। এই মন্ত্র পাঠের ফলে বাইরে থেকে কোন জিন-ভূতও প্রবেশ করতে পারবে না, বাইরে থেকে কোন ওঝা যদি 'বাণ মারা'র চেষ্টা করলেও তা আর সম্ভব হবে না। তারপর বন্দনা গান শুরু করা হয়। বন্দনা গানে বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়, তারপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম নিয়ে তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার পর গুরু বন্দনা করে দেবী বিষহরীর গান শুরু করা হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিউবুর রহমান পালা গুলি সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন, আমি আমার গুরুর কাছ থেকে শুনে শুনেই সমগ্র পদ্মপুরাণের পালা গুলি শিখেছি। পালা গুলি আঞ্চলিক (সিলেটি) ভাষায় পরিবেশিত হয়। এইরকম দুটি পালার গান আমাকে তিনি শুনিয়েছেন। নিম্নে পদ্মপুরান পালা গুলির কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হল –

লক্ষিন্দরের জন্ম বৃত্তান্ত পালা –

'শুনরে গো জয়বিষরী।
মরিয়া যাউকা বেটা না পুজিমু তরে।।
আমি পুঙ্গার পুজা নাই সে করমু জীবনেও তারে।
শুন শুন চান্দ সদাগর শুনিয়া লও তোর কানে।।
আর একটা বেটা জন্ম লইব তোর ঘরে।
আর সেই বেটা মারমু আমি বিয়ার কাল রাইত।।'

পদ্মাপুরাণের শেষ পালা –

'আমারে লইয়া চলো রে শ্বশুরের দেশে।
জিইয়া আইনলাম লক্ষিন্দর দেবের নগর।।
আমারে লইয়া চলো রে শ্বশুরের দেশে।'

এই ভাবে পদ্মপুরাণের এক একটা পালা শেষ করার পর এক একটা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ তিনি করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ –

প্রথম মন্ত্র –

'কার বাড়ি আইলাম রে ভাই।
বইবার দেয় না ঠাই।।
তাই এক ছিলিম তামুক দেও চাইন।
হুক্কা আনো খাই, দিলাম আমি মনসার দুই হাতে।।
লামরে পুঙ্গার বিষ, ভাটিবলি মনসা হইলা আশিষ।
আজ্ঞি মন্ত্র কইলে রইতায় নারে বিষ।।
মন্ত্রে ঘাম গতর লাম বিষ।
নালে ছাকিয়া দিব মা পদ্মার জালে।।'

দ্বিতীয় মন্ত্র –

'পদ্মাবতীর দুই স্তন শিওরে থইয়া।
লামরে বিষরী বিষ নাচিয়া নাচিয়া।।
আকাশ ফাটিয়া পাতাল কাটি চন্দ্র সূর্য কাটি।
সাঁথাইল পর্বত কাটি, তামাকাটি রুপা কাটি।।
তোমা কাটি, সোনা কাটি যে বান্দছে তারে কাটি।
তেত্রিশ কোটি বান্দ কাটি, কাটি লোহার খিল।।
যেই না পথে আইলে বিষ সেই না পথে নিকল।
যদি ছাকিয়া রইবে তোর মা বিষরীর মাথা খাইবে।।
যদি ছাকিয়া রইবে কালী কামাখ্যার মার মাথা খাইবে।
চল বিষ চল শির সপ্তম পাতালে চল।।
কার আজ্ঞে-কামাখ্যা মার আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে-জলদেবীর আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- শ্মশান দেবীর আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- পাতাল দেবীর আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- বনদেবীর আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- স্বর্গ দেবীর আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- দুর্গা দেবীর আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- আস্তিক মুনির আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- কার্তিক গণেশের আজ্ঞে,
কার আজ্ঞে- কামরূপ কামদেব খানিশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে।

যদি এ সত্য লড়িব তেত্রিশ কোটি দেবতার মুন্ড ছিড়িব।।
চল বিষ চল, শীঘ্রই চল 'ঘা' মুখে চল।'

'আজ্ঞা স্মরণ' করা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে,

> "বাংলা লৌকিক মন্ত্রের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'আজ্ঞা স্মরণ' বা 'দোহাই দেওয়া'। যেকোনো বিষয়ের যেকোন মন্ত্রেরই এ -একটা অপরিহার্য অঙ্গ।"[৯]

বস্তুত লৌকিক মন্ত্রে, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে একাধিক দেবদেবীকে উদ্দেশ্য করে স্মরণ বা আজ্ঞা নেওয়া হয়। লোকমন্ত্র সম্পর্কে তুতিউর রহমানের মনে এতটাই বিশ্বাস যে, মন্ত্রের সাথে আলাদা একটা ঐশী শক্তি থাকে; সেই জন্য মন্ত্র কার্যকরী হয়।

তৃতীয় মন্ত্র –

কালারে কাজল বিষ কালা তোর হিয়া।
গরল রে বিষ, ডাকিতে না শূণ্য বিষ - ওই শুন ডে কাল।
ভাটি দিয়া যাও এ সুর পাতালে।
এ কথা,শুনিয়া পদ্মার বিষে দিলা ভাটি।
ভাটি দেওরে পদ্মার বিষ, আমি তোর আশিষ।
স্পর্শে যাও স্পর্শে যা কালগুড়ি বিষ।
বিষরী গো লও না কার গায় তিলোপানি।
গাইটে মুটে এখনই তুমি বাপ আমি ঝি।
বাপে ঝি ধরে আফুলা চৈলতা তলে পুছা মন্ত্র বিষ চলে।
চলরে বিষ চল স্বর্গীয় সপ্তম পাতালে চল।'

চতুর্থ মন্ত্র –

'ওরে ওড়িনারে হরে বুড়া চিনিতে না পারি।
এৎ বুড়া চেৎ বুড়া হিতা বুড়া -
চালো থাকে চাল বুড়া জলও থাকে জল বুড়া,
উলু বুড়া ডলু বুড়া কালা কচুয়া বুড়া-
কালিয়া পার্বতী বুড়া, সিংহে করে রাও।
আর যেথায় আইছলায় পুঙ্গার বিষ-
সেথায় পার তলায় যাওরে বিষ।
শীঘ্রই লামিয়া যা রে বিষ যা শীঘ্রই নাম।
যেই না পথে আইলে বিষ সেই না পথে নিকল।।
যদি ছাকিয়া রইবে তোর মা বিষরীর মাথা খাইবে।
যদি ছাকিয়া রইবে কালী কামাখ্যা মার মাথা খাইবে।।
চল একবার গিয়া সপ্তম পাতালে ভর কর।
চল বিষ চল, চল গার্ললি গান পরিমাণ -
তুমি আমার দাস গুরু, সমান গুরু,
গুরু মহা গুরু, আমার গুরু আদমশিষ।
বিষম ভদর চাইর কালিমা বিষ করাইলাম নির্বিষ।
চল বিষ চল এবার সপ্তম পাতালে ভর কর।'

উল্লেখ্য, প্রত্যেকটা মন্ত্রের শেষে ওঝা বিশেষ প্রক্রিয়ায় রোগীর কানের কাছে গিয়ে একটা 'ফুঁক' বা 'ফুঁ' দেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে,

> "বিভিন্ন প্রকার ঝাড়নের মত ফুঁ/ ফুঁকও (ফুঁ দেওয়া) বিভিন্ন প্রকারের হয়। - ফুঁক হল গুণিনদের মন্ত্র প্রয়োগের প্রাথমিক কাজ।"[১০]

লক্ষণীয়, তুতিউর রহমান সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় লোক মন্ত্রে তান্ত্রিক দেবী কামাখ্যার নাম বারে বারে নিয়েছেন। কিন্তু,আমরা জানি,

> "তন্ত্রে মাতৃকা, ডাকিনী যোগিনী প্রধানা দেব-দেবীদের অনুচর ও সঙ্গিনী বিশেষ ও মহা শক্তিশালী রূপে বিরাজিতা। আসামে কামরূপ কামাখ্যায় দেবী কামাক্ষী পঞ্চতত্ত্বেই পূজিতা। পঞ্চতত্ত্বের পূজায় বামাচার নামে পরিচিত।"[১১]

কালাইন ঝারা –

এই ভাবে অনেকগুলো মন্ত্র প্রয়োগ করার পরে যখন বিষ নামে না তখন 'কালাইন ঝারা' বা 'কালান্তি' মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়। কালাইন ঝারার সময় উপস্থিত সবাইকে শরীরের সমস্ত গিট্ট,কবচ- মাদুলি ইত্যাদি খুলে রাখতে হয় কারণ, যেখানে গিট্ট থাকবে বা কবচ-তাবিচ থাকবে সেখানে বিষ এসে ভর করতে পারে। আবার মন্ত্র গুলি চলাকালীন কেউ হাসতে পারবে না, বা পরিহাস করতে পারবে না এবং, হাত খোলা রাখতে হবে, বসে থাকলেও চলবে না। এইসব যদি কেহ পালন না করে তাহলে তার শরীরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে নতুবা শরীরে বিভিন্ন জটিল উপসর্গও দেখা দিতে পারে। আসলে কালাইন ঝাড়ার মন্ত্রগুলি খুবই অশ্লীল। দুজন মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এগুলো শুনতে লজ্জা হয় অথচ, আসরে ওঝা (বিষ ঝাড়তে গিয়ে কিভাবে এই অশ্লীল মন্ত্র গুলি প্রয়োগ করতে পারেন) অনায়াসে এই মন্ত্র গুলি প্রয়োগ করেন। তুতিউর রহমান আমাকে বলেছেন, এই মন্ত্র গুলি আসরে না উঠলে আসে না, তখন আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকে কীভাবে রোগীকে সুস্থ করা যায়। তাই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি। মন্ত্রগুলি আসলে দেবী মনসা ও শিব ঠাকুরকে নিয়ে কুৎসিত গালাগালি। কালাইন ঝাড়াকে অনেক সময় 'কালান্তি মন্ত্র'ও বলা হয় কয়েকটি মন্ত্রের নমুনা নিম্নরূপ –

কালাইন ঝাড়ার মন্ত্র – ১

'পদ্মা লইয়া মহাদেবে করিল গমন।
পদ্ম বনে গিয়ে দেখো দিল দরশন।।
এরেবেলা মহাদেবে, কি কাম করিল।
চিৎ করিয়া পালাই দিল পদ্মবনের মাঝে।।
আর দুই-অ উরাত বাইয়া পড়ে রাঙ্গা পানিরে বিশ্বর।
এক বাগে সপ্তম পাতালে ভর কর।।'

কালাইন ঝাড়ার মন্ত্র - ২

'পদ্মাবতীর দুইটা স্তন আটি কলার থুর।
শিব বুড়া লটকিয়া রইছে কলার বাগুত রে।।
লামরে বিষ লাম শীঘ্রই সপ্তম পাতালে লাম।
যদি ছাকিয়া রইবে তোর মা বিষরীর পী।
কইতাম নি লাজ কথা, লাজ কথা কইলে বিষ লাইমবায়রে।।
বিশ্বর এক ভাগে সপ্তম পাতাল ভর কর।'

কালাইন ঝাড়ার মন্ত্র - ৩

'পদ্মা গেছলা আমপাড়াত, গাছে লাগলো কোটা।
চিৎ অইয়া পড়লা, পদ্মার চিলে নিল (-) টা।।

পদ্মাবতী এখানে খাল, লংগাই নদীর খাল-খাত।
খালর পারো রুইয়া থইছইন গুছি গুছি (-) রে।।
বিশ্বর এক বাগে সপ্তম পাতালে ভর কর।'

কালাইন ঝাড়ার মন্ত্র - ৪

'গাং পারর মরিচ ডুবা হলা-ডিলা করে।
পদ্মাবতীর দুইটা স্তন আটি কলার থুর।।
শিববুড়া লটকিয়ে রইছে কলার বাগুতরে।
বিশ্বর একবাগে সপ্তম পাতালে ভর কর।।'

কালাইন ঝাড়ার মন্ত্র - ৫

'শিব গেছলা নাওয়াত লগুণ থৈছলা ঘরো।
আতাই ফিতাই চাইয়া দেখইন লগুণ পড়ছে জালো।।
শিব পদ্মারে (-) পদ্ম বনে গিয়া।
লামরে পুঙ্গার বিষ তুমি নাচিয়া নাচিয়া।।
লাজ নাইরে লজ্জাবতী শরম নাই রে তোর।
ডংগোয়ার ঝুলইয়া থইছত আসরের উপর।।
যদি ছাকিয়া রইবে ডংগোয়ার শরীরে।
দোহাই দিয়ার মা মনসা শিবের মাথা খাইবে।।
বিশ্বর এক বাগে সপ্তম পাতালে ভর কর।'

কালাইন ঝাড়ার মন্ত্র - ৬

'কালা রে কাজল বিষ কালা তোর হিয়া।
তোমার মাঝে গরল বিষ পরর ক্ষতি করিস।।
পদ্মা গেছলা কচু উনাত পচা (-) টা লইয়া।
আর চিনা জুকে ধরিলাইছইন আধ পাইয়া হইয়া।।
এমন দোয়াই পাতাই দিলা দুবড়ী ঘাসর জড়।
আর আধ পাইয়া মরিচ ভাঙ্গি তাইর (-) টার উপর।।
আর কইতাম নি লাজ কথা, লাজ কথা কইলে বিষ লাইমবায়রে।।
বিশ্বর এক ভাগে সপ্তম পাতাল ভর কর।'

লক্ষণীয়, এইসব লোক মন্ত্রে ওঝাদের স্থির কোন বিধিবিধানের প্রশ্নই ওঠে না। যদিও সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় ওঝারা আংশিক ভাবে ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। ওঝা রোগীর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে পদ্মাপুরাণের পালা গুলি পয়ার, ত্রিপদী, লাচাড়ি, কিচ্ছার মাধ্যমে কোন বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই পরিবেশন করেন। সঙ্গে দোহার দেওয়ার জন্য এক জন বা দুজন লোকও থাকতে পারে। বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আসলে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যায়,কিন্তু আমরা যন্ত্র ব্যবহার করি না। আমরা লক্ষ্য করেছি, কালান্তি মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গি কিছুটা অস্পষ্ট হলেও উচ্চারণের গতি কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে। বস্তুত বিষ না নামা পর্যন্ত একটার পর একটা পদ্মা পুরাণের পালা চলবে এবং পালার সমাপ্তিতে মন্ত্র পাঠ (ঝাড়া)। এই প্রক্রিয়ায় একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন, পাঁচ দিনও লাগতে পারে; যতক্ষণ না রোগীর শরীর থেকে বিষ নামছে। বিষ ঝাড়ার প্রক্রিয়া বলতে তিনি বলেছেন, বিশেষ অসুবিধা না হলে রোগীকে ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় কলা পাতার উপর শায়িত অথবা বসিয়ে রেখে বিষ ঝাড়তে হয়।

এবারে আমরা মূল শুরুতে ফিরে আসছি, কালাইন ঝাড়া মন্ত্র প্রয়োগের পর 'ডোর ধরা' বা 'হিছার বান্দে'র

পালা। এই ডোর ধরা আসলে পদ্মাপুরাণের এক-একটা পালার শেষে যখন, ওঝা মন্ত্র পাঠ শেষ করবেন তখন-

১. রোগীকে জিজ্ঞেস করা হবে বিষ তোমার শরীরের কতটুকু পর্যন্ত আছে।
২. রোগী যদি অজ্ঞান থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করার আর কোন প্রয়োজন নেই তখন, রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করেই পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হতে হবে।
৩. রোগী যদি বলে মাথাতে খুব যন্ত্রণা, তাহলে বুঝতে হবে বিষ এখনো মাথাতে রয়ে গেছে। ঠিক এইভাবে বুকে, পিঠে, পেটে, কোমরে যন্ত্রণা থাকলে বুঝতে হবে শরীরের এইসব স্থানের মধ্যে বিষ রয়ে গেছে। এইসব নানা লক্ষণ দেখে ওস্তাদ 'ডোর' ধরবেন।

'ডোর' ধরার মন্ত্রটি নিম্নরূপ –

'ডোর ডোর আটিয়া, ডোর ডোর মাটিয়া।
ধরলাম ডোর শিবের কলিঞ্জা কাটিয়া।।
যদি ডোর ছুটিবে ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়িবে।
তবে যদি ডোর ছুটিবে হযরত আলীর মাথা খাইবে।।
থাক ডোর বসিয়া আমি ত্রি জগৎ ঘুরিয়া।'

এই মন্ত্রটি সাতবার পাঠ করে আঙ্গুল দিয়ে ওঝা রোগীর শরীরের বিষের উপর টান দিলে সেখানে 'বান্দ' হয়ে যায়। অর্থাৎ বিষ যতটুকু নামছে তার উপরে টান (এই টানকে 'পোছ'ও বলা হয়)। এইভাবে পদ্মপুরাণের এক একটা পালা শেষ করে মন্ত্র পাঠ করে 'ডোর' ধরে ধরে যখন বিষ 'ঘা' মুখে নেমে আসে তখন রোগীর ক্ষতস্থানের নিচে কলাপাতা দিয়ে ওঝা কাঁচ অথবা ব্লেড দিয়ে একটা টান দিয়ে দেন। তখন ক্ষতস্থান থেকে কালো রক্ত বের হতে থাকে। কালো রক্ত বের হওয়ার পর আপনা আপনি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এটাকে বলে 'বিষগালা' অর্থাৎ গলানো। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, মা বিষরীর একটা আশীর্বাদ থাকার দরুণ তিন দিনের পূর্বেই 'পোছে'র কাটা দাগ মিলিয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকার পোকার কামড় থেকে শরীর থেকে রক্ত পড়া সহজে বন্ধ হয় না কিন্তু, মায়ের আশীর্বাদ ব্লেড দিয়ে অনেকটা কাটা স্থান থেকে সহজেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি বলেন, যদি কেহ আমাদেরকে সাপে কাটা কোন রোগের চিকিৎসার জন্য নিতে আসে তাহলে, তখনই খবরটি শোনা মাত্র আমরা ভাত খাই না। কারণ ভাতের রং নীলাভ হয়ে যায় এবং এর স্বাধ তেতো হয়ে যায়। সেই ভাত খেলে কিছু হয় না কিন্তু আমরা খাই না। একজন সাপে কাটা মানুষের বিষ ঝাড়ার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, পাথারকান্দি অঞ্চলের বিদ্যানগর গ্রামের একজন মানুষকে সাপে কেটেছে, রোগীকে দেখেই বোঝা গেল খুবই নার্ভাস। এখনই বুঝি মানুষটা মারা যাবে। সেই সময় আমার সাথে দুজন দোহারও ছিল। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা গেল বিষ রোগীর মাথা পর্যন্ত উঠেছিল কিন্তু, এখন বিষের মাত্রা বুকের মধ্যে বেশি। বুকে বিষ থাকার দরুণ আমার মনে দুর্বলতা দেখা দেয় কারণ, বুকে বিষ বেশি সময় থাকলে রোগী মারা যেতে পারে। রোগীর শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে তখনই, তার দু'কানে মন্ত্র পাঠ করি। তারপর এক এক করে চোখে, মুখে, নাকে, মন্ত্রপাঠ করি। কানে মন্ত্র পাঠ করার ফলে রোগী একটু একটু করে মাথা নাড়তে থাকে। মন্ত্র পাঠের ফলে রোগীর শরীর যখন একটু নরম হতে থাকে তখন, তাকে সোজা করে বসানো হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ঝাড়ার পর বিষ রোগীর কোমরে এসে নামে। যার ফলে রোগীর কোমরের উপরের অংশ সচল হয়ে যায়। ঠিক তার দু ঘণ্টা পর বিষ গলানো হয়, তখন রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে হাঁটা-চলা করে খাদ্য গ্রহণ করে। মা বিষরীর আশীর্বাদের জন্যই আমাদের মন্ত্রগুলি আজও কাজ করে, সাপে কাটা রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে খুব তাড়াতাড়ি।

এবার সাপে কাটার পরীক্ষা (ক)

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'

অথবা

'ওং হিং রিং রিং অহিং অহিং বং রিং বিং বিং অহিং বিং।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ধরনের বীজ মন্ত্র গুলি বিভিন্ন মন্ত্রের ধ্রুপদী পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ওঝা বা গুণিনরা এই ধরনের বীজ মন্ত্র আবৃত্তির আকারে পাঠ করে থাকেন। তুতিউর রহমানের বক্তব্য, উপরিউক্ত মন্ত্র পাঠ করে জল ভর্তি নতুন একটি মাটির কলসের বাইরের দিকে সিঁদুর দিয়ে এই মন্ত্র লিখতে হবে। তারপর দর্শকদের মধ্যে যেকোনো একজনকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করা হবে, 'এই কলসির মধ্যে কি আছে?' তিনি কলসির মধ্যে তাকিয়ে যা দেখবেন তাই বলবেন। হয়তো সাপ, নেউল অথবা বিচ্ছু অথবা ব্যাঙ ইত্যাদি। আসলে কলসির মধ্যে যে প্রাণী রোগীকে দংশন করেছে তাকেই দেখা যাবে। দেখার পর পরিচয় পর্ব- সাপ হলে কোন জাতের, বড় নেউল না ছোট নেউল, বিচ্ছু হলে কালো না বাদামী রঙের, এইভাবে রোগীকে যে প্রাণী দংশন করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে আমরা দংশনের দাগ দেখেই বুঝতে পারি, সাপে কাটা না অন্য কোন প্রাণীর কামড়। সংশয় যাতে না থাকে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষায় আমাদের দলের কেউ থাকেনা কারণ, আমাদের দলের মানুষ যদি এই কাজটা করে তাহলে, অন্যরা বলবে 'এটা তাদের মনের ইচ্ছা।'

সাপে কাটার পরীক্ষা (খ)

১. যদি বেশ বড় দুটি কাটার দাগ থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে 'ধুড়া' সাপের কামর, এই সাপের কামড়ে কোন ক্ষতি হবে না।

২. সামান্য ছোট কাটার দাগ, কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণার সাথে নির্দিষ্ট অংশ ফুলতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে 'কচুয়া' সাপের কামড়। বিষের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক নয় কিন্তু, বিষ ঝাড়তে হবে নতুবা ক্ষত অংশ পচে যাবে এবং শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

৩. ছোট কাটার দাগ হলে বুঝতে হবে 'বুড়া' বা 'পাতালত' জাতীয় সাপের কামড়। এই ক্ষেত্রে রোগী শরীরকে স্থির রাখতে পারবে না, এবং রোগীর শরীর অনবরত মোচড় দিতে থাকবে। এই ক্ষেত্রেও বিষের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক নয় কিন্তু বিষ ঝাড়তে হবে, নতুবা ক্ষত অংশ পচে যাবে এবং শরীরে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

৪. মধ্যম দাগ অথচ গভীর ক্ষতচিহ্ন তাহলেই বুঝতে হবে কোবরা (আলদ) সাপের কামড়। আমাদের বরাক উপত্যকায় সবচেয়ে বিষধর সাপ হচ্ছে কোবরা জাতীয় এই 'আলদ' সাপ। এই সাপের কামড়ে রোগীর শরীর নীল রং ধারণ করে এবং রোগীর জিব্বাও নীলাভ হয়। এই ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতে হবে নতুবা রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কোন ওঝা যদি বিষ নামাতে পারেন না তাহলে, তিনি রোগীর পরিবারের সদস্যদেরকে বলবেন, আপনারা তাড়াতাড়ি অন্য ওঝাকে আনতে মানুষ পাঠান। তুতিউর রহমানের বক্তব্য, আমরা থাকা অবস্থায় বিষ একই জায়গায় স্থির থাকবে কারণ, অন্য ওঝা যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাই। নিজে না পারলেও রোগীকে ছেড়ে আমরা যাই না কারণ, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলে বা আমরা থাকা অবস্থায় বিষ আর উপরে উঠবে না। এই ধরনের বিপদের সময় যেকোনো ওঝা প্রাণপণ চেষ্টা করবেন যাতে রোগীকে বাঁচানো যায়।

প্রত্যেকটা সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে দুটি গভীর দাগ এবং নিচে সামান্য একটি দাগ থাকবে। শুধু দাগ দেখলে চলবে না, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রোগীর সাথে মেলাতে হবে। চোখের নীল রঙ বা জিব্বার নীল রঙ যদি

স্বাভাবিক করা যায় তাহলে বুঝতে হবে বিপদ কেটে গেছে। বর্তমানে হসপিটালের ঔষধ প্রয়োগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিষের প্রতিক্রিয়া কেটে যায়। তাছাড়া বর্তমানে অনেকেই এই বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে, আগের মতো আর সাপে কাটা মানুষের মৃত্যু হয় না। আমাদের বরাক উপত্যকায় সাপে কাটা মানুষের বিষ ঝাড়নের বহু মন্ত্র আছে, রোগীর অবস্থা অনুযায়ী মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়। আবার প্রত্যেক গুণিনের মন্ত্রও আলাদা। মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে মন্ত্রের ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং সচেতন ভাবেই মন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে আমরা লক্ষ্য করি। মন্ত্রের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের শব্দের প্রয়োগের সাথে নানা ইন্দ্রজাল, এবং আভিচারিক অনুষ্ঠান আমরা লক্ষ্য করি। বস্তুত লোক মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটনা চক্রকে নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষ অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ করতে চায়। বর্তমান নিবন্ধের সকল লৌকিক মন্ত্রই বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। মন্ত্র গুলি কেবলমাত্র আঞ্চলিক দুর্বোধ্য শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত মন্ত্র হলো সকল জীব, প্রাকৃত, অপ্রাকৃত বিষয়ের রহস্যময় অমোঘ শক্তি।

> "এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র জগৎ, ধর্ম, জ্ঞান, ঈশ্বর, দেবদেবী। আমাদের ওঝা-গুণিনদের মন্ত্র সেই বিশ্বাসেরই অনুবর্তন করছে। সুতরাং মন্ত্র বলে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করার ঘটনা বিশ্বাসের জগতে অসম্ভব কিছু নয়।"[১২]

তথ্যসূত্র :

১. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ- অগ্রহায়ণ - ১৪১০, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৩
২. ঘোষ, ডঃ রীতা, সর্পভাবনা সংস্কৃতির দর্পণে, পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৫, কলকাতা-৯, পৃ. ২৩
৩. পূর্বোক্ত, সর্পভাবনা সংস্কৃতির দর্পণে, পৃ. ২৪
৪. মিস্ত্রি, সুভাষ, দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৭৩, প্রকাশকাল - ১৯৯৯, পৃ. ৭৫
৫. পূর্বোক্ত, সর্পভাবনা সংস্কৃতির দর্পণে, পৃ. ৪৬
৬. পূর্বোক্ত, সর্পভাবনা সংস্কৃতির দর্পণে, পৃ. ৩০
৭. গুপ্ত, বিজয় প্রণীত ও বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য সংকলিত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ – বৈশাখ (১৩৪২), পৃ. ২৩০
৮. পূর্বোক্ত, দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র, পৃ. ১১০
৯. পূর্বোক্ত, দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র, পৃ. ৭৯
১০. হালদার, বিমলেন্দু, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ (দ্বিতীয় খন্ড), রত্নাবলী, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৭, পৃ. ১০০
১১. কৃপাশংকর, রহস্যতত্ত্বে পূজাতন্ত্র ও পূজা পদ্ধতি, গিরিজা, প্রথম প্রকাশ - ২০০৪, কলকাতা-৯, পৃ. ৭৪
১২. পূর্বোক্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ. ২০৭